Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৪ জুলাই, ২০২০

৪৩ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১৩ জুলাই, ২০২০, সোমবার, ২৮ আষাঢ়, ১৪২৭

পরিযায়ী শ্রমিকদের বিক্ষোভ মেমারি থানায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ জুলাই : মেমারি থানার বড়পলাশন গ্রামের প্রায় ৩৫০ জন পরিযায়ী শ্রমিক আজ মেমারি থানায় এসে তুমুল বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি তাঁরা কাজ হারিয়ে ভিন রাজ্য থেকে ফিরেছেন কিন্তু রাজ্য সরকারের যে ফুড কুপন দেওয়ার কথা আছে তা তাঁরা কোনো দপ্তর থেকে পাননি। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস পেয়েছিলেন, কিন্তু খাদ্যসামগ্রী এখনও পর্যন্ত তাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। এব্যাপারে তাঁরা স্থানীয় বড়পলাশন পঞ্চায়েতের কাছে বার বার বলা সত্ত্বেও কোনো সুবিধা পাননি, তাই তাঁরা একপ্রকার বাধ্য হয়ে মেমারি থানায় জমায়েত হয়েছেন। তাঁদের দাবি পুলিশি হস্তক্ষেপ করে এই সমস্যার সমাধান করুক।

পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে থেকে এক পরিযায়ী শ্রমিক আবুল হাসান জানান, পড়পলাশন-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক ফুড কুপন পেয়েছে, কিন্তু তাঁরা এখনও পর্যন্ত পাননি। এ ব্যাপারে বিডিওর কাছেও গিয়েছিলেন কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তাই মেমারি থানার হস্তক্ষেপ দাবি করছে তারা।

মেমারি থানার ওসি সুদীপ্ত মুখার্জী বিক্ষোভরত পরিযায়ী শ্রমিকদের ডেপুটেশন গ্রহণ করেছেন এবং তিনি বলেছেন তাঁদের সমস্ত কাগজপত্র বিডিও ও পঞ্চায়েত অফিসে জমা দিতে।

জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে যুবদের সাইকেল মিছিল, সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জুলাই : রেল বেসরকারিকরণ, পেট্রোল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং শূন্যপদে নিয়োগে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে আজ পৃথকভাবে সাইকেল মিছিল ও সভা করে যুবরা। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা শহর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে চকবাজার থেকে মিছিল শুরু হয়। সারা কালনা শহর পরিক্রমার পর চকবাজারে সংক্ষিপ্ত সভার মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শেষ হয়। বক্তব্য রাখেন যুব নেতা নেপাল সরকার। অন্যদিকে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে কুলটি বাজারে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বীরেশ্বর নন্দী, গৌতম হালদার, ত্রিদিব চ্যাটার্জী, জয়দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পীযূষ চ্যাটার্জী।

ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকরা বিপাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৭ জুলাই : চরম বিপাকে পড়েছেন বাইরের রাজ্য থেকে ফিরে আসা ঝাউডাঙ্গার পরিযায়ী শ্রমিকরা। পূর্বস্থলী-২ ব্লকের এই শ্রমিকরা নিজের বাড়ি ফেরার পর হাতে কাজ নেই, রোজগার নেই। সংসার একেবারে অচল হয়ে পড়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ। ঝাউডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের হালতাচড়া ও কাশিপুর গ্রামের ভিন রাজ্য থেকে ফিরেছে প্রায় ৭০০ পরিযায়ী শ্রমিক। বেশিরভাগ শ্রমিকই কাজ না পেয়ে হতাশায় ডুবে আছেন। কেউ কেউ এলাকায় রেগা প্রকল্পে কাজ পেলেও মজুরি পাচ্ছেন না ঠিকমতো। তাদের ২০৪ টাকা করে মজুরি দেওয়ার কথা থাকলেও কম মজুরি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। শ্রমিকদের দাবি, তাঁদের মজুরি দেওয়া হয় ১০০ টাকা থেকে ১৬০ টাকা করে। অধিকাংশ পরিযায়ী শ্রমিকেরই জব কার্ড নেই। পরিবারের লোকজনের জবকার্ড থাকলেও তাদের ১০০ দিনের কাজ দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ। এদিন সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা দেখতেই কাজ না পাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকরা ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁরা বলেন, সপ্তাহে ছ'দিন কাজ করেও মেলে না পুরো মজুরি।

সিআইটিইউ-এর তহবিলে অর্থদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ৭ জুলাই : অপরিকল্পিত লকডাউনে সব থেকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা। এই পরিস্থিতিতে তাদের কাজ থাকবে কি থাকবে না, সেটা ভাবতে ভাবতেই শ্রমিকরা দিশাহারা। তার মাঝেই কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইনেই বদল ঘটিয়ে তাঁদের অর্জিত অধিকার হরণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। দ্রব্যমূল্য দিন দিন ক্রমবর্ধমান হলেও লকডাউনের অজুহাতে মালিকরা শ্রমিকদের মজুরি কমানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। শ্রমিকদের এই সংকটময় সময়ে তাদের পাশে সিআইটিইউ-এর মতো একটি শ্রমিক- দরদি সংগঠনের খুবই প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই এই সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য সিআইটিইউ-এর তহবিলে ২ হাজার টাকা দান করেন এক প্রাক্তন শিক্ষক। মন্তেশ্বরের এই শিক্ষক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল ওই টাকা আজ মালডাঙ্গায় শ্রমিকনেতা তাপস চ্যাটার্জীর হাতে তুলে দেন।

১০০ দিনের কাজের মজুরি না মেলায় জিটি রোড অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৯ জুলাই : আজ মেমারি থানার নিমো এলাকায় অজস্র দিনমজুর ১ ঘন্টা জিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মেমারি-১ ব্লকের নিমো-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ দিনমজুরেরা নিমো-১ পঞ্চায়েত প্রধানের নির্দেশে ১৮ ও ৭ নং সংসদের ১০০ দিনের কাজ করেন। গত ২২ এপ্রিল ২০১৯ সাহাপুর স্কুল থেকে নিমো রেললাইন পর্যন্ত মাটির রাস্তার নির্মাণ কার্যে প্রায় ২২০০ শ্রমিক কাজ করেন। তাঁদের বলা হয়েছিল কাজ সম্পূর্ণ হলে মজুরি দিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এক বছরের উপর হয়ে গেলেও সেই কাজের মজুরি শ্রমিকরা পায়নি। তাদের অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম কৈবর্তকে বারবার বলা সত্ত্বেও কোনো সুরাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আজ প্রায় ৪০০ জবকার্ডধারী শ্রমিক নিমো পঞ্চায়েত অফিসে ডেপুটেশন দিতে যান, সেখানে পঞ্চায়েত প্রধানকে না পেয়ে তাঁরা জিটি রোডে ১ ঘন্টা ধরে অবরোধ করে অবস্থান বিক্ষোভ করেন।

মেমারি থানার পুলিশ বিক্ষোভরত শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে এবং তাদের বুঝিয়ে পথ অবরোধ তুলে দেওয়া হয়। ১ ঘন্টার অবরোধে জিটি রোডে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। অবরোধ ওঠার পর দিনমজুরেরা মেমারি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেন। বিডিও বিপুল কুমার মণ্ডল এই ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

রেল হকারদের বিক্ষোভ সমাবেশ কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ জুলাই : রেল বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আজ কালনার তেঁতুলতলায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেন রেল হকাররা। সিআইটিইউ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রেল হকার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে এই সমাবেশে ভাষণ দেন এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন বাম সংগঠনের প্রতিনিধিরা। বক্তব্য রাখেন গোবিন্দ মণ্ডল, পাঁচু মোহন্ত, অজয় দাস, জনা মুখার্জী, সুজয় সাহা, তাপস দাস প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন বাবলু শীল। রেল বেসরকারি করা যাবে না বক্তার কণ্ঠেই শোনা যায়।

কেন্দ্র ও রাজ্যের কৃষক নীতি ও কৃষকের দুর্দশা

কিশোর মাকর

"অন্নের লাগি মাঠে
লাঙ্গলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া
খাতার পাতার তলে
মনের অন্ন ফলে।"

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় চাষির লাঙ্গলে আঁচড় কেটে সমাজে অন্ন জোটে। যেমন কলমের আঁচড়ে মনের অন্ন ফলে। সেই চাষিই আজ খাদের কিনারায়। কেন্দ্রের কৃষক সম্মাননিধি, রাজ্যের 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পে দু'জনেই দাবি করছে চাষির দ্বিগুণ, তিনগুণ আয় বেড়েছে। যদিও এই রাজ্যে কেন্দ্রের প্রকল্প লাগু করেনি। প্রথম প্রথম 'কৃষক বন্ধু'-র টাকা ক্যাডারের পকেট ভরছিল। এখন সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকায় বড় চাষির পুজো পরবে জামা, প্যান্ট কিনতে সাহায্য হচ্ছে বটে কিন্তু গরিব, বর্গাদার চাষি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই। বরং দেশের সঙ্গে রাজ্যেও চাষির আত্মহত্যা বাড়ছে। পর্চা যার টাকা তার। ফলে শহরে বসে ও অপেক্ষাকৃত ধনী ও শিক্ষিত মানুষ নিজের নামে পর্চা করে নিয়েছে। বঞ্চিত হচ্ছে প্রকৃত চাষি, বর্গাদাররা। এর দায়ভাগ ভূমি সংস্কারের সাফল্য দাবি করা বামফ্রন্ট পর্চা ও কম্পিউটারাইজড্ কাজ করে যায়নি। এই প্রকল্পে কয়েক হাজার কোটি টাকা চলে যাচ্ছে সরকারি কোষাগার থেকে অথচ ওই টাকাটাই যদি কৃষকের ফসল কিনে নিতে সরকার ভর্তুকি দেয় তাহলেই সব কৃষকের উৎপাদিত ফসলে দু'পয়সা বেশি পেয়ে মুখের হাসি আরও চওড়া হতো। এখন যা দাম পায় তা উৎপাদিত ফসলের খরচের সমান অথবা তার থেকেও কম। সব কৃষক এর সুযোগ পেত। যা ঘটেছে কেরলে। ধানে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে গত মরশুমে ১৮৩৫ টাকা কুইন্টাল সরকার দাম দিয়েছে সেখানে কেরালা সরকার কিনেছে ২৬৯০ টাকা কুইন্টাল। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে ১৮২০ টাকা কুইন্টাল। একজন কৃষকও বাদ থাকে না সরকারি দামে বিক্রি করতে। সেই পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে কেরল সরকার। এরাজ্যে সেই পরিকাঠামো না থাকার কারণে মিল মালিকের এজেন্ট ফোড়েরা অভাবি বিক্রির আশায় থাকে। সরকারি দামের সুযোগ নেয় ধনী চাষিরা। তারা পাটার ডগায় ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয় না। গবির, বর্গাদাররা খপ্পরে পড়ে ফোড়েদের হাতে। তাছাড়া বাড়ি থেকে ১ কিমি, ২ কিমি দূরে কিষানমান্ডি অবস্থিত। এই ধরনের চাষিদের না আছে টাকার বল না আছে কোমরের জোর। ফলে অভাবি বিক্রি করতে আরও দেনার ফাঁদে জড়িয়ে যায়। এরা আবার কিষান ক্রেডিট কার্ড বা ব্যাঙ্ক ঋণ পায় না, নিজ নামে পর্চা না থাকায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে না পায় ক্ষতিপূরণ না পায় সরকারি দাম। ফলে পড়ে মহাজনের হাতে। উল্লেখ্য— বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই গরিব কৃষক ও বর্গাদাররা দু'পয়সা লাভের মুখ দেখেছে। তখন সরকারি দামের থেকে বাজারে দাম বেশি থাকতো।

এদিকে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা কোভিড-১৯। দীর্ঘ লকডাউনে খেতমজুরদের কাজ কমেছে। চাষির ও মজুরের অভাব এবং সার, কীটনাশক, পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ায় উৎপাদন খরচ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সুযোগ বুঝে কেন্দ্র এই লকডাউনে কৃষি সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স পাশ করিয়ে নিয়েছে। কৃষিপণ্যের দাম এবং অত্যাবশ্যকীয় আইন তুলে নেওয়ায় কপাল চওড়া হয়েছে কর্পোরেট সংস্থার। সরকার হাত তুলে নেওয়ায় কৃষি নির্ভর ভারতে চাষিদের ফসলের দাম ঠিক করবে কর্পোরেট সংস্থা। অবাধ বাণিজ্য এবং চুক্তি-চাষ বাড়বে।

গতবার লোকসভার ভোটের আগে কৃষক-দরদি সাজতে বিখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী এম. এস. স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ মেনে নেওয়ার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক কী আছে সুপারিশে—(১) দেশব্যাপী অসমাপ্ত ভূমি সংস্কারের আমূল সংস্কার করতে হবে, (২) সেচের অনিশ্চয়তা দূর করতে হবে সরকারি উদ্যোগে, (৩) প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিধানের ব্যবস্থাকে গরিব

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১৩ জুলাই, ২০২০

স্বৈরাচারী কায়দা

মোদীর নেতৃত্বে আরএসএস-বিজেপি সরকার তাদের আদর্শগত অ্যাজেন্ডা ভারতবাসীর উপর চাপিয়ে দেবার কাজ করে চলেছে। বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে তারা যেমন সংসদ বন্ধ রেখে, সংবিধানের মৌলিক নির্দেশকে অস্বীকার করে, গরিব কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে আরও শোষণ করার ব্যবস্থা একতরফাভাবে চাপিয়ে দিচ্ছে—তেমনই জ্ঞানের জগতে শিক্ষার জগতে অন্ধকার নামিয়ে আনছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বোর্ড সিবিএসই-র নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সিলেবাস সংকোচনের নামে বেছে বেছে সেইসব বিষয়গুলি বাদ দেওয়া হয়েছে যেগুলির সঙ্গে আর.এস.এস-এর আদর্শগত অবস্থান মেলে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, নাগরিকত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবাধিকার, লিঙ্গচেতনা, আঞ্চলিক আকাঙ্ক্ষা, বিভেদনীতি, দেশভাগ, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়গুলি ছাত্রসমাজের মগজে আদৌ যাতে স্থান না পায় সেই ব্যবস্থা পাকা করার কাজ করা হয়েছে। ভারতের সংবিধান ভারত ভাবনার মৌলিক ভিত্তি। বৈচিত্র্য, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্রের ধারণাকে যা প্রসারিত করে আর.এস.এস-এর তা চক্ষুশূল। কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা থেকে তারা মানুষের ওপর আনুগত্যের অনুশাসন চাপিয়ে দেয়। স্বাধীন চিন্তা ও মতপ্রকাশের ধারণাকে তারা মান্যতা দেয় না। স্বৈরাচারী কায়দায় তারা মানুষের মনোজগতে দাসত্বের বেড়ি পরিয়ে রাখতে চায়। ধর্মীয় বৈচিত্র্য বা সাংস্কৃতিক বহুত্বকে তারা স্বীকার করে না। উচ্চবর্ণের হিন্দু আধিপত্যকে মান্যতা দিয়ে তারা সমগ্র সমাজকে বশে রাখতে চায়। এমনকি সমাজে নারীর মর্যাদা বা সমানাধিকার তারা স্বীকার করে না। তাদের চোখে নারী পুরুষভোগ্য, পুরুষের সেবা ও সন্তান উৎপাদনই নারীজীবনের একমাত্র অভীষ্ট হওয়া উচিত। অতি দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্তসুলভ আদর্শের দ্বারা তারা পরিচালিত। তাদের মনোজগতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোনো স্থান নেই। তাই ভারতের সংবিধান যে উদার গণতান্ত্রিক বৈষম্যবর্জিত নাগরিকত্বের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছে আর.এস.এস-বিজেপি তার বিরোধী। হিন্দু ছাড়া আর কোনও ধর্মকে তারা মান্যতা দেয় না। আর সেজন্যই তারা এখন থেকেই আগামীর নাগরিকদের চেতনাকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। আগামী দিনের নাগরিকরা যাতে স্বাধীনচেতা, বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী না হয়ে উঠতে পারে তারই ব্যবস্থা তারা পাকা করতে চায়। সেজন্যই পরিকল্পিতভাবে সিলেবাস সংকোচন করা হয়েছে।

চিঠিপত্র

মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

ব্যতিক্রমী কেরালা

সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতও যখন করোনা মহামারীতে আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত, তখন এই মহামারীকে প্রতিহত করার সংগ্রামে ভারতের একমাত্র বাম-শাসিত রাজ্য কেরালার অনন্য সার্থকতা চরম বাম-বিরোধীরাও অস্বীকার করতে পারছেন না। চূড়ান্ত লকডাউনের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও করোনা আক্রমণ প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে সরকার তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে অসামান্য সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। মালায়ালম প্রবাদে কথিত আছে, হাতে হাত মিলিয়ে পর্বতকেও নড়ানো সম্ভব। জনগণ, নানা চরিত্রের রাজনৈতিক দলসমূহ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মহাসম্মিলনে কেরালা এই প্রবাদের যথার্থতা প্রমাণ করেছে।

কেরালা সরকারের এই সাফল্যের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিক্ষাব্যবস্থার বিপর্যয়-মোকাবিলায় মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অন-লাইন বিদ্যাদানের আওতায় নিয়ে আসা। মে-মাসের শেষে এক সমীক্ষায় দেখা যায় কেরালা স্কুলবোর্ডের ২.৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর বাড়িতে টিভি নেই, অন-লাইন শিক্ষা গ্রহণের সামর্থ্যও তাদের নেই। এক স্কুল-ছাত্রী এই কারণে আত্মহত্যাও করে। তার পরেই রাজনৈতিক দলসমূহ, সাধারণ মানুষ, অনাবাসী ভারতীয়, ব্যবসায়ী, চিত্রতারকা প্রভৃতিরা স্মার্ট টিভি, মোবাইল ফোন ও ট্যাবলেট প্রদানে এগিয়ে আসেন। কিছু সরাসরি শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হয়, কিন্তু বেশিরভাগই দেওয়া হয় অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগহীন সুদূর গ্রামগুলির গ্রন্থাগারগুলিতে অথবা সেই সব অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রগুলিতে যেগুলি গণ-শ্রেণিকক্ষে পরিণত হয়েছে। কেবল অপারেটররাও শিক্ষার্থীদের গৃহে বা গণ-শ্রেণিকক্ষে তিন মাস বিনা পয়সায় সংযোগ দান করে। ২.৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর কাছেই এই সব সুবিধা পৌঁছে যায়। পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে বাম ছাত্র-সংগঠন এস.এফ.আই ও যুব সংগঠন ডি.ওয়াই.এফ.আই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কংগ্রেস সহ অন্যান্য দলগুলিও কমবেশি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে।

এই সামগ্রিক উদ্যোগ ও সার্থকতার কেন্দ্রে রয়েছে সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বাধীন কেরালার বাম সরকার, বাম দল ও তার গণসংগঠনগুলি। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গণ-উদ্যোগ সৃষ্টির সঠিক পন্থা-পদ্ধতির মাধ্যমে কঠিনতম সমস্যারও সঠিক সমাধানের পথে কীভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিকূল অবস্থান সত্ত্বেও কেরালা সরকার তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ স্থাপন করেছে। আর পশ্চিমবঙ্গ এখনও অন্ধকারেরই পথযাত্রী।

তপন ভট্টাচার্য
বর্ধমান

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়—একান্ত ব্যক্তিগত

জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী

১৯৮৮ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর দায়িত্বে সুপ্রিম কোর্টের রিজার্ভ ব্যাংকের তিনজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও তাঁদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের 'রজনীগন্ধা' হলে একটি সভার আয়োজন হয়। রাজ্য সমবায় ব্যাংকের তরফে উপস্থিত আধিকারিকদের মধ্যে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

সভা চলাকালীন দেখছি এক সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা প্রৌঢ় রাজ্য সমবায় ব্যাংকের কার্যাবলীর কঠোর সমালোচনা করছেন। মনে মনে বিরক্ত যে হইনি তা নয়। কিন্তু দেখলাম যে উনি মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডলের PACSO সম্পর্কে একটি মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। মন্ত্রী মহাশয়ের পদক্ষেপ ঠিক নয় বলে জানাতেও দ্বিধা-বোধ করেননি। এরপর আমার ওনার প্রতি শ্রদ্ধাটা বেড়ে গেল।

পরদিন অফিসে এসে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এ.সি. তপাদারকে ওনার সম্পর্কে জানতে চাইলে বললেন, ওনাকে চেনেন না? উনি বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় আর আপনাদের ব্যাংকের আগামী দিনের চেয়ারম্যান।

১৯৮৯ সালের ২৭ জুন মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ রিজার্ভ ব্যাংকের আধিকারিকদের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে চেয়ারম্যান হয়ে আসেন। সেদিন কর্মচারীদের মধ্যে সাজ-সাজ রব। কেউ আনন্দে আবার কেউ ভয়ে। মালা নিয়ে সব সংগঠনের নেতারা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরণ করেন। অভ্যর্থনার পর্ব শেষ হতে আমি স্যারের সাথে দেখা করে নিজের পরিচয় দিয়ে বোর্ড-রুমের তিনটে আলমারির চাবি ওনার হাতে তুলে দিয়ে চলে আসি।

দুদিন পর ব্যাংকে এসে আমায় ডেকে পাঠান। বোর্ডরুমে স্যার একাই ছিলেন। যেতেই আলমারির চাবিগুলো আমায় ফেরত দিয়ে বললেন—এগুলো তোমার কাছেই রাখবে জ্যোতি। সেই থেকেই আমি স্যারের কাছে 'জ্যোতি' হয়ে গেলাম। তিনতলা থেকে আমার বসার জায়গা দোতলায় করে দিয়েছিলেন।

দায়িত্ব নেওয়ার পরেই বিশেষ আদেশে তিনি কর্মচারীদের কোনো ধরনের বদলি বন্ধ করে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দূরদর্শিতা। মাস ছয়েক পর ট্রান্সফারের খসড়া আমায় দিয়ে বললেন—এটা কনফিডানসিয়াল, কেউ যেন জানতে না পারে।

এই ট্রান্সফারের খবরটা আমার সংগঠনের নেতারা পেয়ে আমায় চাপ দিতে শুরু করেন এবং এই বলে ভয় দেখান যে "আমাদের সাথে অশোকদার(?) সম্পর্ক তো জান। উনি কিছু বলবেন না। 'আমি কপি না দেওয়ায় একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে ওনারা চলে যান। স্যার আসতেই ঘটনাটা বলায় আমায় একটা কথাই বলেছিলেন—"তুমি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

এরকম অনেকবার আমার বিরুদ্ধে গোপনীয়তা ফাঁসের মিথ্যে অভিযোগ জানানো হলেও তিনি কোনদিন তা বিশ্বাস করেননি—ফলে ব্যাংকের উপর আপনা হতেই দায়বদ্ধতা বেড়ে যায়।

ব্যাংকের এ্যাসেট বাড়ানো তাঁর মজ্জায় ছিল। পুরানো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরির সময় রাত ১২টা-১টা অবধি কাজের তদারকি করেছেন। এসব দেখে নিজেরাও উৎসাহিত হয়েছি।

জ্যোতি বসু নতুন বাড়ি উদ্বোধন করেছিলেন। উপস্থিত মন্ত্রীদের মধ্যে বিনয় চৌধুরী, অসীম দাশগুপ্ত, ছায়া ঘোষ ইত্যাদিরা ছিলেন। ওনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি আমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আমি কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মতামত দিলে সেটা মন দিয়ে শুনতেন। কোন কোন সময় সেটা গ্রহণ করেছেন।

তখন স্যার ডব্লু.বি.এফ.সি-র চেয়ারম্যান। একদিন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর একটা চিঠি স্যারের অনুমতি নিয়ে আমায় ইস্যু করতে বলেন। চিঠিটা পড়ে আমার খটকা লাগে। স্যার তখন ডব্লু.বি.এফ.সি যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে আমায় চিঠিটা দেওয়া হয়েছে

কিন্তু জানতে চাওয়ায় বললাম 'না'। কেন? আপনি ঘুরে আসুন তখন বলব। 'ঠিক আছে' বলে উনি চলে গেলেন। ওই অফিস থেকে এসেই আমায় ডেকে পাঠিয়ে চিঠিটা না দেওয়ার কারণ জানতে চাওয়ায় বললাম—যদি এই চিঠি সেই কর্মচারীকে দেওয়া হয় এবং যে কারণের কথা বলা হয়েছে সেই কারণ দেখিয়ে অন্য এক কর্মচারীকে দিতে হবে। ব্যাপারটা বুঝে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে ডেকে ওই চিঠি ইস্যু না করার কথা বলেন। আসলে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ইউনিয়নের টানে ওই চিঠি তৈরি করেছিলেন।

ব্যাংকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন অদ্ভুত দক্ষতায়। কোনো চাপের কাছে মাথা নত করতে দেখিনি—এমনকি রাজনৈতিক চাপের কাছেও।

বিভিন্ন আধিরকারিক সংগঠনের চাপে ভুল নোট পেশ করতেন। যেহেতু আমার মাধ্যমে তা যেত ফলে কোনো গণ্ডগোল দেখলেই স্যারকে জানিয়ে দিতাম। এরকম একটা ভুল এ্যাজেন্ডা বোর্ড-এ দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে আমার কাছে আসে। স্যারকে সঙ্গে সঙ্গে জানাতেই অফিসারদের ডেকে ধমকে বললেন—"আমি সত্যিই একজন ভালো প্রাইভেট সেক্রেটারি পেয়েছি—যে আজ একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বাধা দিয়েছে।"

স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনে সহায়তা করা ও সদস্যাদের উৎসাহিত করতে তিনি ওই গোষ্ঠীর সাথে সভা করতে যেতেন—সঙ্গী হতাম আমি।

সেবার বালুরঘাটে এক সীমান্ত লাগোয়া গ্রামে গিয়েছি। গ্রামটিতে হিন্দু-মুসলমান একসাথেই থাকে ও বিভিন্ন গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান মিলেই গ্রুপ। প্রায় দেড়শোজন মহিলা সদস্যা উপস্থিত। হঠাৎ স্যার একটি প্রশ্ন করলেন—"দেখছি গ্রুপের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষ আছেন। যদি এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় আপনারা কী করবেন?" প্রশ্নটা এখানকার সময়ে কেউ করতে পারবে কিনা জানি না। উত্তর শুনে অবাক না হয়ে থাকতে পারিনি। —"আমাদের রক্ত লাল—ওই দাঙ্গা এখানে হতে দেব না।" গ্রামটার নাম মনে নেই। চাইব যেন সেই মানসিকতাই এখনো বজায় থাকে।

আরও একবার সুন্দরবনে গেছি। ওখানে গেলে রাঙাবেলিয়ার তুষারদার কাছে যেতেন। তুষার কাঞ্জিলাল। গ্রামে মাস্টারমশাই নামে পরিচিত ছিলেন। একরাত থেকে পরদিন যাব ঝড়খালি। ওখানে স্বয়ম্ভরগোষ্ঠীর সাথে সভা আছে। দীর্ঘ পথ। শেষ অব্দি যখন ওখানে পৌঁছলাম তখন ভাটার টানে লঞ্চ এগুতে পারেনি। পাড়ে দেখছি তখনও মহিলারা অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ দেখি স্যার গামছা পরে প্রস্তুত। হেঁটে যাবেন। অনেক বুঝিয়ে ওনাকে ওভাবে যাওয়া থেকে বিরত করি। শেষ অব্দি নৌকো করে সদস্যারা এসে লঞ্চেই সভা করেছিলেন। সমবায়কে তিনি ভালোবাসতেন। দল-মতের কোনো পার্থক্য ছিল না।

NAFSCOB-এর সর্বভারতীয় সভাপতি হয়ে বিদেশ সফর শেষে উদ্বৃত্ত টাকা ফেরত দেওয়ায় ওই সংস্থার এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আমায় স্যারের সততা সম্পর্কে যা বলেছিলেন সেটা এখানে প্রকাশ করা উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বাংলাদেশ থেকে ঘুরে আসার পর যে হিসাব দাখিল করেছিলেন সেটা দেখে অবাক না হয়ে পারিনি। নদী পারাপারের নৌকো ভাড়া থেকে রিকশা ভাড়া কোনটাই বাদ যায়নি হিসাব থেকে। অফিসের বিরোধী কর্মচারী সংগঠনও কোনোদিন স্যারের সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি।

সমবায়ের নিয়মানুযায়ী ১৬.৫.১৯৯৫-তে মইনুল হাসানকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়ে নিজে ডিরেক্টর হিসাবে থাকেন। কিন্তু এম.পি হওয়ার পর ২০.৮.৯৮-তে মইনুল হাসান পদ্যতাগ করায় স্যার আবার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৬.১.২০০৫ অবধি ওই দায়িত্বে ছিলেন।

ওই সময়টা আমার সাথে সম্পর্কটা অনেকটা দাদা-ভাই-এর মতো। তবে কাজে গাফিলতি হলে একদম ছেড়ে কথা বলতেন না। ঠাট্টার ছলে বলতাম, স্যার আমি বেতনের ৭০ শতাংশ পাই আপনার বকা খাওয়ার জন্য, আর বাকি ৩০ শতাংশ কাজের জন্য। মুচকি হাসতেন স্যার।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সমবায় প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। সমবায় আন্দোলনকে ভারতে প্রথম সারিতে তুলে এনেছিলেন রাজ্যকে। প্রধান অফিস নির্মাণ ছাড়াও কুচবিহার, ডায়মণ্ডহারবারের অফিস নতুন ভাবে তৈরি করান। বনগা, বারাসত ছাড়াও শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চকে স্থানান্তরিত করে দিবা-রাত্রির ব্রাঞ্চ হিসাবে চালু করেন। ওই শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চ উদ্বোধনের ৭ দিন আগে আমায় আর স্পেশাল অফিসারকে পাঠিয়ে দেন নিমন্ত্রণপর্ব সারবার জন্য।

NAFSCOB-এর সর্বভারতীয় সভাপতি হিসাবে বিভিন্ন রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। মূল দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমায়।

আর.বি.আই, নাবার্ড-এর কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট গুরুত্ব দিত স্যারকে। বিভিন্ন কমিটির সদস্যও ছিলেন তিনি।

—এরপর চারের পাতায়

বৃক্ষরোপণ হোক হিসেব করে

সঞ্জীব চক্রবর্তী

একটা গাছ কেটে ফেলতে হলে তার বদলে নিশ্চয়ই পাঁচটা গাছ লাগাতে হবে, কিন্তু 'সন্দ-পিশাচ' তো প্রশ্ন করতেই পারে—যদি পাঁচটা গাছ লাগাবার জায়গাই থাকতো, তাহলে মানুষ একটা গাছই বা কাটল কেন? বাস্তবে আইন বা বিবেকের তাড়নায় যা হবে তা হল প্রমোটারের বৃক্ষ রোপণ—যাদের পাঁচ কোণায় টবে পাঁচটি তুলসীগাছ লাগিয়ে দিলেই হিসেব একেবারে বরাবর হয়ে যাবে।

প্রকৃতি কিন্তু অঙ্কে কাঁচা নয়। প্রকৃতি নিজের হিসেব ঠিক বুঝে নিয়ে এসেছে; নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে এসেছে স্মরণাতীত কাল থেকে। এই পুনরায় গুছিয়ে নেবার পর্বে যদি জলস্তর নামতে নামতে মাটির তলের ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যায়, মানুষ গাছপালা পশুপাখি শুকিয়ে মরে যায়, কার কী? তাপমাত্রা আর বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসের মাত্রা বাড়ুক, পৃথিবীর সব গ্লেসিয়ার গলে যাক, তাতে পৃথিবী নামক গ্রহের থোড়াই এল আর গেল। সে না হয় আরেকটা বুধ, শুক্র বা মঙ্গলের মতো প্রাণহীন গ্রহ হয়ে সূর্য পরিক্রমা করবে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হবে না। লোকসানটা হবে কেবলমাত্র মানুষের। কারণ পৃথিবীর পরিবর্তিত রূপ মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সহায়ক নয়। অন্যদিকে পশুপাখি গাছপালারও মাথাব্যথার কারণ নেই; প্রথমত, তারা এমনিতেই বিপন্ন, তাদের নতুন করে হারাবার কিছু নেই; দ্বিতীয়ত আসন্ন বিলুপ্তি সম্পর্কে চেতনাও নেই, জানা নেই প্রতিকারের উপায়ও। কিন্তু কিছু মানুষ অন্তত জানেন যে আমাদের জন্য বসবাসের উপযুক্ত একটিই গ্রহ আছে। তার নাম পৃথিবী। দূর মহাকাশে কোনো গ্রহের অস্তিত্ব ধরা পড়লে তাত্ত্বিক আনন্দ হতে পারে; বাস্তবে কোনো সুরাহা হবে না। পৃথিবীর পরিবেশ দূষিত হয়ে উঠছে অহরহ। এই গ্রহ বাসের অযোগ্য হয়ে গেলে হয়তো গ্রহান্তরে উপনিবেশ স্থাপন হতেও পারে। কিন্তু সে কল্পবিজ্ঞান কবে বাস্তবায়িত হবে জানা নেই এবং গ্রহান্তরে যাবার সুযোগ পাবেন অঙ্গুলিমেয় বাছাই করা কয়েকজন। তাতে বাকি শত শত কোটি মানুষের আহ্লাদিত হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না।

এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ রক্ষার দায় কেবল বিজ্ঞানীদের; আমরা চা খাব, গল্প কবিতা তাত্ত্বিক প্রবন্ধ লিখব, সেমিনার করব সেলফি-বান্ধব বনসৃজন করব—ভেবে থাকলে রেহাই পাওয়া যাবে না। কিছুদিন আগে কলকাতার গঙ্গা নদীর বুকে আয়োজিত এক কবিতা উৎসবের রিপোর্ট বের হয় এক ইংরেজি দৈনিকে। প্রতিবেদকের মন্তব্য ছিল এই সব মিহি সুরের পাঠ করা কবিতায় নদীটার কোন্ উপকার হল বোঝা গেল না। বরং জলে নেমে দু কোদাল পলি তুলে ফেললে নদীর বেশি উপকার হতো। দুচারজন কবি জল থেকে উঠতে না পারলেও ক্ষতি হতো না। আসলে অস্তিত্বের সঙ্কট ঘনিয়ে এলে শেক্সপীয়ার মিলটন রবীন্দ্রনাথ বিটোফেন মোৎসার্ট আদি শিল্প সাহিত্য দর্শন সকলই বৃথা হয়ে যায়। ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চল শুকনো। বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে রোজ। হাতিরা মরছে ইলেকট্রিকের শক খেয়ে, ট্রেনে কাটা পড়ে, বোমাভরা আনারস চিবিয়ে। ২০১৯ সালের চেন্নাইয়ে চরম জলকষ্ট, আইলা আম্ফানের থাবা, বহু সমস্যা বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের সভ্যতা কতখানি ঠুনকো। আজ অদৃশ্য ভাইরাস করোনার আক্রমণে বিশ্বে মৃত্যুর সংখ্যা পাঁচ লক্ষ অতিক্রম করে গেছে। মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। করোনা লকডাউনের অবসরে পৃথিবীর গাছপালা পশুপাখির স্বস্তি আর বাতাসের নির্মল চেহারা দেখিয়ে দিয়েছে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির বিরোধিতা ও সংঘর্ষ কোন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এখনও যদি মানুষের চেতনা না ফেরে, কুৎসিত লোভ আর ক্ষমতা-সর্বস্ব রাজনীতির পথ ত্যাগ না করে, শেষের সে দিন আরো দ্রুত ঘনিয়ে আসবে এটুকুই বলা যায়।

পৃথিবীতে মহামারী, অতিমারী, মহাযুদ্ধ নতুন কিছু নয়। কিন্তু সে সময় পৃথিবী আরো তরুণী ছিল, জনসংখ্যার চাপ ছিল কম, সম্পদের ভাণ্ডার ছিল আরো পূর্ণ। সুতরাং পরপর আসা আঘাত সামলে নতুন উদ্যমে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় শুরু করা সম্ভব হয়েছে। এখন বিপুল জনসংখ্যার চাপ সামলে প্রায় নিঃস্ব পৃথিবী কতদিন কেবলমাত্র দিনযাপনের জন্যই শোষণ সামলাতে পারবে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় আছে। করোনা-উদ্ভূত বিপর্যয় জনজীবন ও অর্থনীতি অবশ্যই প্রকৃতির তরফ থেকে আসা একটা গম্ভীর সতর্কবার্তা। আমরা নিজেদের সংশোধন করবো কিনা আমাদের সিদ্ধান্ত।

আমাদের সভ্যতার চাকা যেভাবে ঘুরছে তার গতিরোধ করা যাবে না অনেক বাস্তবোচিত কারণেই। নানা ক্ষেত্রে সংযম বা নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করলেও চালু ব্যবস্থা বজায় রাখতেও ব্যয় অনেক। লোকসংখ্যা বাড়ছে। নগর বাড়ছে, জলাভূমি বোজানো হচ্ছে প্রকাশ্যে বা গোপনে, বন উজাড় হচ্ছে, বনের বুক চিরে যাওয়া রেলে কাটা পড়ছে হাতি, মারা পড়ছে বন্যপ্রাণী। মানব সভ্যতাও মরবে। এই মৃত্যুর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করব বেহিসাবির মতো, না আনুষ্ঠানিকতা ছাড়িয়ে পরিবেশ রক্ষা সম্পর্কে একটু আন্তরিক হয়ে শেষের ভয়ংকর সেদিনকে একটু পিছিয়ে দেব সেটা আমাদেরই সিদ্ধান্ত।

বন-মহোৎসব আসছে। বন-সৃজন হোক। লাগানো গাছগুলোও বাঁচুক। বন্ধ হোক বেহিসাবি বৃক্ষরোপণ যাতে আমফান-পরবর্তী বিপর্যয়ের কুনাট্যের পুনরাবৃত্তি না হয়। আর লাগানো হোক পশুপাখি-কীটপতঙ্গ সকলের বান্ধব স্থানীয় গাছ। খানিক স্থান রাখা থাক আগাছা বলে কথিত আঞ্চলিক গাছপালাদের জন্য। পার্থেনিয়াম নিয়েও ভাবনা হোক।

অরণ্য সপ্তাহের অনিবার্যতা

রামপ্রণয় গাঙ্গুলী

বাঁচার উপায় :

কৃষির প্রবর্তন হবার পূর্বে মানুষ ছিল সম্পূর্ণরূপে বনচারী। শিকার করে ও ফলমূল সংগ্রহ করে ক্ষুধা মেটাতো। সভ্যতার অগ্রগতি যত ত্বরান্বিত হয়েছে বনভূমি থেকে বন কমেছে, ভূমি বেড়েছে। আজও যা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত বৈজ্ঞানিকদের মতে গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণের মাত্রা ধীরে ধীরে কমাতে না পারলে পৃথিবী আর বাসযোগ্য থাকবে না। কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ ঠেকাবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী জগৎজোড়া লকডাউনের সময় প্রাপ্ত উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে জানা গেছে দূষণ উল্লেখযোগ্যহারে কমেছে, সবুজ গ্রহের আবহাওয়ামণ্ডলের গুণগত উন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু তা তো একান্তই নিরুপায় অবস্থার ফল। সাময়িক ব্যবস্থা। কাল-কারখানার উৎপাদন ও গণপরিবহণ বন্ধ করতে মানুষ বেঁচে থাকার রসদই সংগ্রহ করেতে পারবে না। কবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতেও পারবে না—"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ'নগর।" তাহলে উপায়? সবুজের সন্ধানে নির্মল পরিবেশর চাষ বাড়ানো। চাষ শব্দটির সঙ্গে বর্ষার সম্পর্ক 'মা'র সঙ্গে ছা'-এর মতো; তাই এ'রাজ্যে বর্ষাকালে অরণ্য সপ্তাহ বা বনমহোৎসব উদ্‌যাপন হয়ে আসছে প্রতি বছর ১৪ থেকে ২০ জুলাই (২৯ আষাঢ় থেকে ৪ শ্রাবণ ১৪২৭)। তাছাড়াও পরিবেশ সচেতন মানুষ বছরভর বৃক্ষরোপণ করে থাকেন।

কেন এই দুরবস্থা :

এক দশক আগের একটা তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মোট বনভূমির ২/৩ ভাগ ছিল মাত্র ১০টি দেশে। যথা—রাশিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, আমেরিকা, চীন, অস্ট্রেলিয়া, কঙ্গো, ইন্দোনেশিয়া, পেরু ও ভারত। উন্নয়নের নামে ফি বছর বিস্তর বনোচ্ছেদ হয়েছে—১৩.৭০ মিলিয়ন হেক্টর, যা গ্রীস দেশের আয়তনের সম পরিমাণ। সমপরিমাণে নতুন বৃক্ষরোপণের নির্দেশ থাকলেও কিয়োটো প্রটোকল মানা হয়নি। বেড়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সংখ্যা ও পরিমাণ। বেড়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদের ঝুঁকি। স্বল্প পরিসরে মহাদেশগুলির চিত্র না দেখে শুধু চোখ রাখি সুন্দরবনে, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ম্যানগ্রোভ অরণ্যে। যা একটি রামসার সাইট, অমূল্য জৈববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ব-দ্বীপের সমষ্টি। আমাদের গর্বের জাতীয় পশু বাঘমামার (রয়েল বেঙ্গল টাইগার) বাসভূমি। আয়লায় আবার ক'দিন আগে তছনছ হয়ে গেছে উম্ফানের তাণ্ডবে। শতাধিক মানুষের সঙ্গে দেড় কোটি গাছ মারা গেছে। ফণী ঘূর্ণিঝড়ে প্রতিবেশী উড়িষ্যাতে মারা গেছিল এক কোটি গাছ। কল্লোলিনী কলকাতা হয়েছে প্রায় বৃক্ষশূন্য। ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তির প্রধান কারণ সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এজন্য দায়ী বিশ্ব উষ্ণায়ন। কোভিডের ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কারে বিজ্ঞানীরা দিবারাত্র লড়ে যাচ্ছেন। বিশ্বউষ্ণায়ন ঠেকাতে আমাদের বনভূমি রক্ষা করতে হবে, অকারণে বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ করতে হবে এবং অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে গাছ বসাতে হবে এবং গাছ বসানোর ও বড় করার জন্য গ্রাম/নগরবাসীকে যুক্ত করতে হবে। কারণ জাতীয় গড়ের তুলনায় (২৩.৮০ শতাংশ) আমাদের রাজ্যের বনাঞ্চলের পরিমাণ অনেকটাই কম (১৪ শতাংশ)। শুধু তাই নয়, একটি তথ্যসূত্রে একবিংশ শতকের শুরুর বছর থেকেই বৃক্ষচ্ছেদন বৃদ্ধির ছবি মিলেছে। যেখানে ২০০০ সালে গাছ ছিল ৩৮,৮৮৭,২০১ হেক্টরে, ২০১৮-তে তা কমে হয়েছে ৩৩,৪১৪, ৮৯১ হেক্টর। উন্নয়নের আড়ালে বনবাসীদের জল-জঙ্গল-জমির অধিকারও আক্রান্ত হচ্ছে। বসুন্ধরার শ্বাসযন্ত্র আমাজন বৃষ্টি বনানীকে যেভাবে শেষ করা শুরু হয়েছে, কতকটা একই কায়দায় তা হচ্ছে। মানুষের স্বার্থের থেকে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার্থে অগ্রাধিকারদানের ফলেই কি এই দুরবস্থা? তাই শুধু গাছ বসালেই হবে না—কারণটি চিহ্নিত করতে হবে এবং নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় জৈববৈচিত্র্যের ভবিষ্যতের সঙ্গে সঙ্গে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতও হবে আশংকাপূর্ণ।

তাই আসুন, ঋণ মেটাই—গাছ বসাই, নিজে বাঁচি— সবাইকে বাঁচাই :

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা যে আয়তনের অক্সিজেন গ্রহণ করি ও বিষবায়ু (কার্বন ডাই-অক্সাইড) ছাড়ি তা সবটাই হয় প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে—শুধুমাত্র গাছ থাকার জন্য। বাজার অর্থনীতির যুগে তা যদি কিনে নিতে হতো তাহলে ক'জন বেঁচে থাকবেন সে হিসাব করার দিন যেন কখনো না আসে। কেবল মনে পড়িয়ে দেওয়া ভালো যে জনস্বাস্থ্য যেখানে পণ্যরূপে বিক্রি হয়। এছাড়া ফুল-ফল-খাদ্য-কাঠ-সৌরভ- প্রাকৃতিক বৈভব-পাখির কলতান- পথচারীর ছায়াদান-গৃহপালিতের আহার্য থেকে কথা ও কাব্যের উপাদান—সার-জ্বালানি গাছের ঋণ মা-বাবার ঋণের মতোই পরিশোধ করার সাধ্য এই পৃথিবীর ধনাঢ্যতম ব্যক্তি বা রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তি কারুই নাই। তাই গাছ লাগাই, প্রাণ বাঁচাই।

এই করোনাকালে ২৫ মে ২০২০ মানব সভ্যতা তথাকথিত সভ্যদেশে দেখলো একটি কালো দিন। সংখ্যালঘু ও কালো বর্ণের 'জর্জ ফ্লয়েড' (৪৬)-কে শ্বাসরুদ্ধ করে (I cann't breathe) শহিদ করা হলো। হত্যাকারীর শাস্তির কোনো খবর নাই।

এখন প্রশ্ন :

বিশ্বের বিনোদন জগতে ভারতের গর্বের মানুষটির করোনামুক্তির জন্য হোম যজ্ঞের সচিত্র সংবাদ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে তাঁদের মতো মানুষ যদি কুসংস্কার দূর করার জন্য একটু এগিয়ে না আসেন তাহলে এই সত্য (মন্দির-মসজিদ-গীর্জা---যেকোনো ধর্মস্থান, করোনাতে সবই বন্ধ/ভরসা কেবল বিজ্ঞান) সমগ্র জনমানসে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে যায় না কি?

১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

কাজী আবদুল করিম

রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কার্যক্রম সংস্থা (ইউ এন ডি পি) ১৯৮৭ সালের ১১ জুলাই দিবসটিকে 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস' হিসেবে পালনের আহ্বান জানায়, ইউনেস্কো এই আহ্বানকে সমর্থন করে। তারপর থেকে প্রতিবছর এই দিনটি 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

১৯৮৭ সালে যখন এই দিবস পালন করা হয়, তখন বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ৫০০ কোটি। আর ২০২০ সালের ১১ জুলাই যখন এই দিবস পালিত হল তখন বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৮০ কোটি। পরিসংখ্যান বলছে প্রতি বছরই জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কিন্তু একই সঙ্গে কমছে বেঁচে থাকার রসদ। ফলে চাপ বাড়ছে প্রকৃতির উপর, পরিবেশ দূষণ বাড়ছে, বাড়ছে দুঃস্থ মানুষের সংখ্যা।

১৯৯৪ সালের ৫-১৩ সেপ্টেম্বর মিশরের রাজধানী কায়রোতে বিশ্ব জনসংখ্যা শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ব সম্মেলনে বিশ্বের ১৮০টি দেশের প্রতিনিধিসহ বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে দীর্ঘ আলোচনায় এবং তথ্যে উঠে আসে ১৮০৪ সালে বিশ্বে জনসংখ্যা ছিল ১০০ কোটি। ১৯২৭ সালে অর্থাৎ ১২৩ বছর পর বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০০ কোটিতে। ৩৩ বছর পর ১৯৬০ সালে জনসংখ্যা পৌঁছে যায় ৩০০ কোটিতে। ১৯৭৪ সালে মাত্র ১৪ বছর পর সংখ্যাটি হয় ৪০০ কোটি। তার ১৩ বছর পর ১৯৮৭ সালের ১১ জুলাই বিশ্বের জনসংখ্যা হয় ৫০০ কোটি। ১৯৯৯ সালে ১২ বছর পর সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৬০০ কোটিতে। ২০১১ সালে হয় ৭০০ কোটি

এবং এই বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের ১১ জুলাই বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৮০ কোটিতে!

১৭৫০ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও রেঙ্গুন) জনসংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৫০ লক্ষ। ২০১১ সালে তা দাঁড়ায় ১৫০ কোটিতে, আর ২০২০ সালের ১১ জুলাই শুধু ভারতের জনসংখ্যা ১৩৮ কোটি। তথ্য বলছে আগামী ২০২৭ সালে ভারত হবে পৃথিবীর সর্বাধিক জনবহুল রাষ্ট্র।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, এই দিনটি উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য হল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে বিশ্বের নানাবিধ সমস্যাগুলিকে খতিয়ে দেখা এবং সমাধানসূত্র বের করা। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকৃতির বিভিন্ন রসদ কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তা নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তার দিন এটা।

পৃথিবীর আয়তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার সীমিত। কিন্তু বিশ্বে বেড়ে চলেছে জনসংখ্যা, ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ঘাটতি, পরিবেশ দূষণ এবং দুঃস্থ মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ, তার জন্য প্রয়োজন মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করা। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই বিশ্বে জনসংখ্যা দিবস পালন।

বিশ্বের অনেক অনুন্নত দেশ আছে এবং আমাদের দেশের অনেক অনুন্নত এলাকা আছে যেখানে সন্তান জন্মের জীবতাত্ত্বিক কারণ সম্বন্ধে বেশিরভাগ পিতা-মাতার কোনো ধারণা নেই, ফলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও তারা অবগত নন। এইসব মানুষদেরকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায়ের বিষয়ে অবহিত করানো একান্ত প্রয়োজন। ১৯৭৯ সালে চীন দেশ তাদের জনবিস্ফোরণ ঠেকাতে 'ওয়ান চাইল্ড পলিসি' গ্রহণ করেছিল, দীর্ঘ চার দশক পর গত বছর থেকে সেই পলিসি তুলে নিয়েছে। ইউরোপের বেশ কিছু দেশে আবার জন্ম সংখ্যাটা তলানিতে ঠেকেছে, ফলে অধিক সন্তান নেওয়ার জন্য পিতামাতাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এই দিবস পালনের জন্য নানা অনুষ্ঠান, পোস্টারের এবং নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ২০২০ সালের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের মূল মন্ত্র বা প্রধান আলোচ্য বিষয় (থিম) হল 'ইতিহাস এবং তাৎপর্য'। এই বিষয় সম্পর্কে মানুষকে অবহিত এবং সচেতন করার প্রয়াস বিশ্বের সরকারগুলি সহ মানুষকে নিতে হবে।

বৈদ্যপুরে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ জুলাই : প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, রক্তদান শিবির, দিয়ে আজ পালিত হয় জননেতা জ্যোতি বসুর জন্মদিন ও প্রয়াত বিশ্বরূপ ব্যানার্জীর প্রয়াণ দিবস। ডিওয়াইএফআই-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এদিন বৈদ্যপুরে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ২জন যুবতী সহ ৫২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুবনেতা অয়নাংশু সরকার, সুধীর ঘটক, মহম্মদ শাহ, সনাতন টুডু, নবকুমার বাগ প্রমুখ।

কৃষক নীতি ও কৃষকের দুর্দশা

—প্রথম পাতার পর

চাষির কাছে পৌঁছে দিতে হবে, (৩) কৃষি প্রযুক্তি এবং উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগ, (৫) ফসলের লাভজনক দরের পাশাপাশি সংগ্রহ ও বাজারজাত করার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা, (৬) উৎপাদনের খরচের সঙ্গে পারিবারিক শ্রম, জমির লিজমূল্য, মূলধন + দেড়গুণ খরচ যোগ করে সহায়ক মূল্য ঘোষণা করতে হবে। অর্থাৎ প্রথম বন্ধনীর মধ্যে খরচ = A2 এর সঙ্গে যোগ করে সব ধরে হচ্ছে C2। এর দেড়গুণ বেশি ধরে সহায়কমূল্যের ঘোষণা করার কথা বলা হয়েছে। প্রতিবার সারা দেশে সমস্ত পণ্যের সহায়কমূল্য ঘোষণা করে কেন্দ্রের কৃষি মূল্য কমিশন। এখানেও তথ্যের জাগলারি করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবারও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকার দাবি করেছেন সহায়কমূল্য ৫০-৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। এবার ২০২০-২১ বর্ষে ধানের সহায়কমূল্য ঘোষণা করা হয়েছে ১৮৬৮ টাকা কুইন্টাল। গতবার ছিল ১৮২০ টাকা। একেই মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছেন সারা ভারত কৃষকসভা। তাঁরা এই ধরনের জাগলারির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। মন্ত্রী যে হিসাব দেখাচ্ছেন তা আংশিক গণনার মধ্যে এনেছেন। যেমন ধানের খরচ ধরেছে ১২৪৫ টাকা। প্রকৃত খরচ যেখানে ২৫৮৩ টাকা। অর্থাৎ গতবার খরচের হিসাব ধরলে ৭১৫ টাকা কম। অথচ প্রকৃত খরচের সঙ্গে ৫০ শতাংশ যোগ করে সহায়কমূল্য দাঁড়ায় ২৬৯০ টাকা। যা কেরালা সরকার ১০০ শতাংশ কৃষকের পাওয়ার পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। নতুন অর্ডিন্যান্স বলে আর তো কৃষিমূল্য কমিশনের কোনো কাজ নেই। এখন তো কর্পোরেট সংস্থা দাম নির্ধারণ করবে। অর্থাৎ পেট্রোল, ডিজেলের মতো বিনিয়ন্ত্রণ করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। করোনা আবহে কৃষকদের জন্য যে প্যাকেজ ঘোষণা হয়েছে তাতে কৃষকের উন্নয়ন হবে বলে মনে করছেন না বিশেষজ্ঞ মহল।

কেন্দ্রের কৃষিমূল্য কমিশন যতবার সহায়কমূল্য ঘোষণা করছে তা যে স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মান্যতা দেয়নি তা একটি লেখচিত্রের মধ্যে দেখানো হলো। পশ্চিমবাংলার প্রধান ফসল ধান।

বর্ষ	শস্য	A2+FL	C2 প্রতিশ্রুতি	C2+৫০%	ঘোষিত
২০১৭-১৮	ধান	১১১৭ টাকা	১৪৮৪ টাকা	২২২৬ টা	১৫৫০ টাকা
২০১৮-১৯	ধান	১২১৪ টাকা	১৫৪৫	২৫০৪ টাকা	১৭২২ টাকা
২০১৯-২০	ধান	১৩১৪ টাকা	১৫৬০	২৫৫০	১৮১৫ টাকা
২০২০-২১	ধান	১৩৪৫	১৬৪৫	২৫৮৩	১৮৬৮

বিখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী এস স্বামীনাথন এই ধরনের সহায়কমূল্য ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করেন। আবার দাম বাড়লেই যে কৃষক এর ফায়দা পাবে তার মানে নেই। সরকার সারা দেশে উৎপাদনের ২০ শতাংশ কেনে। বাকিটা খোলাবাজারে চাষিকে অভাবি দরে ফোড়েদেরকে বিক্রি করতে হয়। রাজ্য সরকারগুলির সেই পরিকাঠামো নেই ধান কেনার। সারা ভারত কৃষকসভার সম্পাদক হান্নান মোল্লা জানান, পারিবারিক শ্রম এবং মূলধন = FL বাদ দিয়েছে কমিশন। শুধুমাত্র প্রকৃত খরচ ধরা হয়েছে। যদিও তার বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই। তথ্য জাগলারির মধ্যে পড়ে কৃষকের দুর্দশা বাড়ছে।

সরকারি পরিসংখ্যান বলছে দেশের কৃষিজীবী পরিবারের ৫২ শতাংশ ঋণগ্রস্ত। ২০১২ সালে সারা দেশে কৃষিঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৭ হাজার কোটি টাকা। মোদি সরকার এই সময়কালে কর্পোরেট ঋণে ছাড় দিয়েছে ১১.৫ লক্ষ কোটি টাকা। অথচ যে কৃষক সমাজে অন্ন যোগাচ্ছে তার জন্য ধানের ছাড়ের ব্যবস্থা নেই। ঠেলে দেওয়া হয় আত্মহত্যার পথে।

সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ জুলাই : সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির সাতগাছিয়া-১ শাখার পার্টি সদস্য বিনয়কৃষ্ণ প্রামাণিক (৬৩)-এর জীবনাবসান হয়েছে। গতকাল রাত্রি ৮টা নাগাদ পূর্ব সাতগাছিয়ার শতপটি সাহাপাড়ার বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গেই কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মাঝপথেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খবর পেয়ে পার্টির নেতা-কর্মীরা তাঁর বাড়িতে ছুটে আসেন। তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানান, পার্টিনেতা রঞ্জিত রায়, মহম্মদ শা, প্রণব রায়, নবকুমার বাগ, আজিজ শেখ প্রমুখ। মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই কন্যা বর্তমান। কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৮৫ সালে পার্টি সদস্যপদ লাভ করার পর তিনি আমৃত্যু সেই পদেই আসীন ছিলেন। ২০১১ সালে পালাবদলের পর বিনয়কৃষ্ণ প্রামাণিকের উপর আক্রমণ নেমে আসে। কিন্তু তিনি মাথা নত করেননি।

প্রকাশিত হয়েছে প্রয়াত
দিলীপ দুবে-র গ্রন্থ

‘এক নিরপরাধের আত্মকথন’

বর্ধমানের ’৬০-’৭০-এর উত্তাল ঝোড়ো হাওয়ার পূর্ণাঙ্গ বিবরণে সমৃদ্ধ এই পুস্তকের মূল্য মাত্র ২৫০ টাকা। পাওয়া যাচ্ছে :

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ-র সবকটি শাখায় ও নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তরে

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। -***কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি***

মন্তেশ্বরে পরিযায়ী শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ৮ জুলাই : ফুড কুপন, কাজ প্রদান সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে আজ মন্তেশ্বর বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান পাঁচ শতাধিক পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁদের দাবি মন্তেশ্বর ব্লকে পাঁচ থেকে ছয় হাজার পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ি ফিরে এসেছে। লকডাউনের সময় কোনো সরকারি সাহায্য ছাড়াই যে-যার মতো করে নিজের বাড়ি ফিরেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ১০০ দিনের কাজ ও খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মন্তেশ্বর ব্লকের কোনো পরিযায়ী শ্রমিকের কাছে সেই সাহায্য বা সহায়তা পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ। এই সমস্যা নিয়ে এদিন মন্তেশ্বর ব্লক আধিকারিক বিপ্লব দত্ত কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনায় বসেন। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি বলে জানান পরিযায়ী শ্রমিক প্রতিনিধি ইয়াকুব সেখ। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বৃহত্তর আন্দোলন হবে এই বিডিও অফিসেই, বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন। এ বিষয়ে ব্লক আধিকারিক বিপ্লব দত্তের সঙ্গে কথা বলার জন্য ফোন করা হয়। কিন্তু ফোন অন্য নম্বরে ফরোয়ার্ড করা থাকায় তা পাওয়া যায়নি।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়—একান্ত ব্যক্তিগত

—দুয়ের পাতার পর

এবার একটা বকা খাওয়া ও আমার তার প্রতিশোধ নেওয়ার ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। তখন তিন মাস অন্তর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের কনফারেন্স হতো। বিভিন্ন জেলায়। জেলায় হলে স্যার মন্ত্রী, সেক্রেটারি, আর.সি.এস ইত্যাদিকে D.O দিয়ে ওই সভায় যাওয়ার অনুরোধ করতেন। D.O টা আমিই তৈরি করে দিতাম। সেবার বিশেষ কারণে জরুরি সভা ডাকতে হয় ব্যাংকের প্রধান অফিসে। সবাইকে নোটিশ পাঠানো হলেও আগেকার প্রথানুযায়ী D.O দেওয়া হয়নি। মিটিং-এর দিন সকালে আর.সি.এস স্যারকে ফোন করে জানান যেহেতু D.O পাননি সেই হেতু তিনি আসতে পারছেন না। স্যারের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আসেননি। সঙ্গে সঙ্গে আমায় ডেকে D.O না দেওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। উত্তরটা শুনে উনি রেগে বললেন, এতটা স্বাধীনতা তোমায় দিইনি।

আমিও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। দিন পনেরো পর আর.সি.এস ব্যাংকের বোর্ডরুমে মন্ত্রীকে নিয়ে একটা সভার ব্যবস্থা করলেও স্যারকে কোনো চিঠি দেননি। ওই সভায় স্যার যাবেন কিনা জানতে চাইলে সোজা বললাম—নেমন্তন্ন পাননি, কেন যাবেন? সভার দিন স্যার উসখুস করছেন। বললাম, কী হল স্যার? দেখ মন্ত্রীমশাই ব্যাংকে এসেছেন। না যাওয়াটা খারাপ। বললাম, নেমন্তন্ন না পেয়ে, D.O না পেয়েও শুধু খবরটা শুনেই আপনি যাচ্ছেন সভায়। সেদিন আপনি বললেও আর.সি.এস কেন আসেননি? হেসে বললেন—ওই দিনের ব্যাপারটা তুমি ভোলনি—না? এরকম সম্পর্ক ছিল আমার সাথে।

১৯৮৯-২০০৫ ও পরবর্তীকালে ২০০৬-২০০৯ (WBIDFC)-তে স্যারের সম্পর্ক উন্নততর হয়েছে। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি ওনার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে। শ্রেষ্ঠ সমবায়ীর পুরস্কারের টাকা বিনা দ্বিধায় দিয়ে দিয়েছেন সমবায়ের স্বার্থে। অভাবী সংসার হওয়া সত্ত্বেও। ২০০৬-তে আমার চেন্নাইতে অপারেশনের দিন পৌঁছে গিয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে। যাতে আমি আর্থিকভাবে কোনো অসুবিধায় না পড়ি। অপারেশনের পর জ্ঞান ফিরে প্রথম স্যারকেই দেখেছিলাম।

স্যার কোলকাতা ছাড়ার পর প্রতি রাত ৮টা থেকে ৮.৩০-টার মধ্যে স্যারকে ফোন করে শরীরের খোঁজ খবর নিতাম। ফোন ধরেই বলতেন, ‘হ্যাঁ জোতি বল’। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। পরের দিকে একটু শোনার সমস্যাও হচ্ছিল। ফোনে না পেলে বৌদির সাথে কথা বলে শান্তি পেতাম। আজ আর সেই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে না, আর শুনতে পাব না ‘হ্যাঁ জোতি বল’— কথাটা। এ দুঃখ, বেদনা কাকে জানাব। স্যার আছেন, থাকবেন প্রতিটি কাজের সাথে।

—***লেখক দীর্ঘদিন প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন ও অর্থ নিগমে।***

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

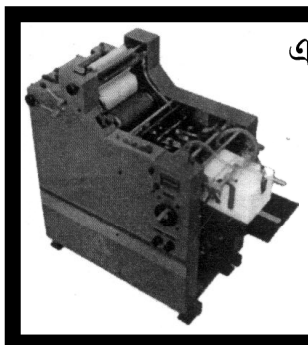

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা